মহৎ প্রাণের সান্নিধ্যে

দ্বিতীয় খণ্ড

[জীবনী ১৫৩-৩৯৮]

মুসলিম মনীষীদের জীবনীর আকর-গ্রন্থ 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'র সংক্ষিপ্তরূপ 'নূযহাতুল ফুদালা'র অনুবাদ

মূল

ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ
আত-তুর্কমানী যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ [৬৭৩-৭৪৮ হিজরী]

সংকলন ও সংক্ষিপ্তকরণ

শাইখ ড. মুহাম্মাদ মূসা আশ-শরীফ

ভাষান্তর

আব্দুল্লাহ মজুমদার

অনুবাদ-সম্পাদনা

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সবুজপত্র

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আ-লামীন, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল-মুরসালীন ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন।

কী দিয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো? তার ভাষা আমার জানা নেই! আল্লাহর অশেষ রহমত, অপরিসীম করুণা ও নিঃসীম কৃপায় আমার এই সামান্য কর্মটুকু প্রকাশিত হয়েছে। ওয়ালিল্লাহিল হামদ!

ছোটবেলা থেকেই ইতিহাসের প্রতি আমার আগ্রহ। ইতিহাস সম্পর্কে কোনো বই পেলে সেটা পড়ার চেষ্টা করি। একজন মুসলিম হিসেবে ইসলামের ইতিহাস জানার ইচ্ছাটাও প্রবল। ইসলামী জ্ঞানের মৌলিক শাখাসমূহ (তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল)-এর সাথে আরো কিছু আনুষাঙ্গিক বিষয় (লুগাহ, তারীখ, সিয়ার, তারাজিম) রয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন-হাদীস কেন্দ্রিক বিবিধ গ্রন্থ লেখা হয়। পরবর্তী যুগে ইমামগণ ইতিহাসকেও বেশ গুরুত্বের সাথে দেখতে শুরু করেন। ইসলামের ইতিহাস ও ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান মুসলিম মনীষাকে তারা বিভিন্ন গ্রন্থে তুলে ধরেন। ইমাম ত্বাবারী রচিত 'তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক' গ্রন্থটি একটি মাইলফলক বলা চলে। যদিও আগে-পরে আরো বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের উপর। ইমাম ইবন কাসীরের জগদ্বিখ্যাত বই 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' সম্পর্কে সবাই কম-বেশি জেনে থাকবেন। এ বইগুলোকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়, তারীখ (ইতিহাস) ও সিয়ার (মনীষীদের জীবনী)।

আমার জীবনাকাশে তিনজন আলেম উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে জ্বলজ্বল করে সর্বদা। ইবনু তাইমিয়্যা, ইবনুল কাইয়্যিম ও যাহাবী –রাহিমাহুমুল্লাহ-। এদের রেখে যাওয়া লিখনী আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে চলতে সহায়তা করেছে। আল্লাহর কাছে চাই, তাদেরকে যেনো জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করেন।

ইমাম যাহাবী আমার কাছে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তার বই যতো পড়েছি, তার চিন্তাধারা ও মানহাজকে যতো জানছি, ততোই তার প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বেড়েছে। ইমাম যাহাবীকে চিনেছি 'সিয়ারু আ-লামিন নুবালা' গ্রন্থটির মাধ্যমে। তার পরিচিতি মূলত মুহাদ্দীস হিসেবে। উলুমূল হাদীসের একজন দিকপাল হিসেবে আলেমগণ তাকে জানেন। এ বিষয়ে তার রচিত 'তাযকেরাতুল হুফ্ফায', 'মীযানুল ই'তিদাল', 'আল-মুঈন', 'আল-মুগনী', 'আল-কাশেফ', 'তাযহীবুত তাহযীব'-সহ বিবিধ গ্রন্থ তালিবুল ইলমগণ অবশ্যই

জেনে থাকবেন। হাদীসশাস্ত্রে যে কোনো হাদীসের বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতার 'মান ও স্তর' পর্যালোচনায় ইমাম যাহাবীর অবদান অনস্বীকার্য।

আকীদার ক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী রচিত 'আল-উলূ' ও 'কিতাবুল আরশ' প্রমাণ বহন করে যে, তিনি সালাফ-সালিহীনের আকীদাকেই নিজের আকীদা হিসেবে ধারণ করতেন। এছাড়া তার রচিত 'কিতাবুল কাবায়ের'-এ কবীরা গুনাহসমূহের একটি তালিকা করেছেন তিনি, যা বাংলায় অনূদিত হয়েছে এবং বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত।

ইসলামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার অনন্য রচনা 'তারীখুল ইসলাম'। আর মুসলিম মনীষার জীবনী বিষয়ে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিয়ারু আ-লামিন নুবালা'। এই যে দুটি বই! এগুলো অতুলনীয়। আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে যতো কাজ হয়েছে, তন্মধ্যে একজন আলেম কর্তৃক সেরা কাজ হিসেবে এ দুটিকে বিবেচনা করাটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়।

'সিয়ারু আ-লামিন নুবালা' বইটি পঁচিশ খণ্ডের এক বৃহৎ গ্রন্থ। 'দারু ইবন হাযম' ও 'দারুল আন্দালুস আল-খাদ্বরা' নামে সৌদি আরবের দুটি পাবলিকেশন্স থেকে এটি প্রকাশিত। লেখক নিজের সময়কালের পূর্ব পর্যন্ত যতো মনীষী পেয়েছেন, তাদের সকলের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কারো জীবনী ছিলো কেবল নাম, বংশ ও মৃত্যুর সনে সীমাবদ্ধ। মূলত এ বইটিকে একটা বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হবে না। বইটি থেকে সাধারণ মানুষ উপকৃত হওয়ার সুযোগ ছিলো না। সে কারণেই সৌদি আরবের শাইখ মুহাম্মাদ মুসা আশ-শরীফ এ দীর্ঘ কিতাবকে নিয়ে এসেছেন মাত্র চার খণ্ডে। তাহলে কি সব বাদ পড়ে গেলো? না! যাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় কিছু পাওয়া গেছে, তাদেরকেই তিনি অন্তর্ভুক্ত করে সাজিয়েছেন সংক্ষিপ্ত বইটি। নাম দিয়েছেন 'নুযহাতুল ফুদালা'। মূল বইটিতে চার খলীফার জীবনী নেই, তাই 'তারীখুল ইসলাম' গ্রন্থ থেকে সেটুকু নিয়েছেন। তারপর সাহাবীদের থেকে শুরু করে শেষ নাগাদ এসেছেন। বইটির সংক্ষিপ্তরূপ বেশ কয়েক বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছে সৌদি আরব থেকে।

বাংলায় সালাফদের জীবনী বিভিন্ন বইয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বইটি মোটামুটি রেফারেন্স বুক বলা চলে, সেটা হলো এই 'সিয়ারু আ-লামিন নুবালা'। তবে এতো বিশাল বই থেকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের খোরাক কতটুকু তা শাইখ মুহাম্মাদ মুসা আশ-শরীফ হয়তো ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সংক্ষিপ্ত করে প্রয়োজনীয় অংশগুলো রেখে দিয়েছেন। ২০১৬ সালের কোনো এক বিকেলে সম্মানিত পিতা ও শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়ের পরামর্শে বইটির অনুবাদ কাজে হাত দিই। অবশেষে 'মহৎ প্রাণের সান্নিধ্যে'

নামে বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে কয়েক বছর পরে। যাতে কেবল সাহাবীদের জীবনী স্থান পেয়েছে। আল্লাহর রহমতে ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে চলেছে। দোআ চাই, মহান আল্লাহ যেনো সবটুকু অনুবাদের তাওফীক দেন।

বিশ্বাস করুন ভাই-বোনেরা, বইটি এতোই অসাধারণ, আমি বলে বুঝাতে পারবো না, কী রয়েছে এতে! যদি আপনারা পড়ে না দেখেন। বইটির বেশ কিছু পাতা আমাকে ভাবিয়েছে, কিছু পাতা আমার চোখে পানি এনেছে, কিছু জীবনীর সাথে নিজের জীবনকে তুলনা করে আফসোস করেছি, কতোই না পিছিয়ে আছি আমরা। আমাদের আদর্শ, আমার কাছে যারা হিরো, তাদের জীবনাচরণ অনুসরণে কতোই না পিছিয়ে। আমরা কি তাদের নাগাল পাবো? তাদের মতো আমরাও কি আল্লাহর কাছে কবুল হবো? আল্লাহ ভালো জানেন!

বইটি প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছেন সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'র মুহাম্মাদ হেলাল উদ্দীন আঙ্কেল। তাকে জানাই অগণিত শুকরিয়া। এতে বহু সংশোধনী ও পরামর্শ নিয়েছি, আমার অগ্রজ জনাব আব্দুর রহমান ভাইয়ার নিকট থেকে। বইটির সম্পাদনা করে দিয়েছেন, আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। আল্লাহ তাদেরকে নেক হায়াত দান করুন। আমীন!

একজন অনুবাদক হিসেবে আমার কী চাওয়া? আমার আসলে তেমন কোনো চাওয়া নেই; আমি ইমাম যাহাবীকে ভালোবাসি হৃদয়ের গভীর থেকে, তার জন্য জান্নাতের দোয়া করি। আরো দোয়া করি, আল্লাহ যেনো এ বইটিকে তার জন্য কবুল করে নেন। কিছুদিন পরই তো এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবো, কবরের দীর্ঘ জীবনে কীভাবে থাকবো জানি না। এ গুনাহগারকে যেনো বইটির উসীলায় ক্ষমা করে দেন মহান আল্লাহ তাআলা। আমাকে যেনো কবুল করেন জান্নাতের জন্য। হয়তো কোনো একদিন জান্নাতের বাগিচায় দেখা হয়ে যাবে ইমাম যাহাবী রাহেমুহুল্লাহ'র সাথে। মুচকি হেসে সালাম বিনিময় করে বলতে পারবো, 'আপনাকে ভালোবেসে আপনার বইটা পৌঁছে দিয়েছিলাম দামেস্ক থেকে সেই সুদূর বাংলায়।' তিনিও হয়তো আমাকে কাছে টেনে বসাবেন। এরপর মেতে উঠবো অনন্ত বাতচিতে, যার কোনো শেষ নেই, কোনো সমাপ্তি নেই। আমরা সেই প্রশান্তির অসীম জীবন কামনা করতেই তো পারি, তাই না?

আল্লাহর ক্ষমার ভিখারী-
আব্দুল্লাহ মজুমদার
১৩ জুমাদাল আখিরাহ, ১৪৪১ হিজরী

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড [জীবনী ১৫৩-৩৯৯]

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	বড় তাবেয়ীগণ	
১৫৩	মারওয়ান ইবনুল হাকাম (খ)	২১
১৫৪	কা'ব আল-আহবার (দ, ত, স)	২২
১৫৫	যিয়াদ ইবন আবীহি	২৩
১৫৬	সিলা ইবন আশ্ইয়াম	২৫
১৫৭	উম্মু কুলসুম	২৬
	আরও যারা নবুয়তের যুগ পেয়েছেন	
১৫৮	যাইদ ইবন সূহান	২৭
১৫৯	উক্ববা ইবন নাফে' আল-ক্বুরাশী	২৯
১৬০	আল-মুখতার ইবন আবী উবাইদ আস-সাক্বাফী	৩০
১৬১	উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ ইবন আবীহি	৩৪
	সিয়ারু 'আলামিন নুবালা : চতুর্থ খণ্ড	
১৬২	মজনু	৩৭
১৬৩	আবূ মুসলিম আল-খাওলানী (ম, ৪)	৩৮
১৬৪	আমের ইবন আবদ ক্বাইস	৪১
১৬৫	উয়াইস আল-কারনী	৪৩
১৬৬	আল-আশতার	৪৫
১৬৭	ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া	৪৬
১৬৮	আবীদা ইবন আমর	৪৮
১৬৯	হারিম ইবন হাইয়ান	৫০
১৭০	আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ ('আ)	৫১
১৭১	আলক্বামা ('আ)	৫১
১৭২	মাসরূক্ব ('আ)	৫৪
১৭৩	সুয়াইদ ইবন গাফালা ('আ)	৫৭
১৭৪	মুররা আত-তাইয়্যেব ('আ)	৫৭
১৭৫	আমর ইবনুল আসওয়াদ (খ, ম)	৫৮
১৭৬	আবুল আসওয়াদ ('আ)	৫৯
১৭৭	আহনাফ ইবন কায়েস ('আ)	৬০

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১৭৮	আসলাম ('আ)	৬৬
১৭৯	শুরাইহ আল-ক্বাদী (স)	৬৮
	প্রথম স্তরের বড় তাবেয়ীদের অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	
১৮০	ইবনুল হানাফিয়্যাহ ('আ)	৭০
১৮১	আল-জুরাশী	৭৪
১৮২	মুয়াবিয়া ইবন ইয়াযিদ	৭৫
১৮৩	হাস্‌সান ইবনুন নো'মান	৭৬
১৮৪	শাবীব ইবন ইয়াযিদ	৭৭
১৮৫	কাত্বারী ইবনুল ফুজাআ	৭৯
১৮৬	উবাইদ ইবন উমাইর ('আ)	৮০
১৮৭	আমর ইবন মাইমূন ('আ)	৮১
১৮৮	শাক্বীক্ব ইবন সালামাহ ('আ)	৮২
১৮৯	যির ইবন হুবাইশ ('আ)	৮৪
১৯০	আবূ উসমান আন-নাহদী ('আ)	৮৫
১৯১	জামীল ইবন আব্দিল্লাহ	৮৬
১৯২	ইবনুল আশ'আস	৮৭
১৯৩	মা'বাদ ইবন আব্দিল্লাহ (ক)	৮৭
১৯৪	মুতার্‌রিফ ইবন আব্দিল্লাহ ('আ)	৮৯
১৯৫	আইয়ূব আল-ক্বির্‌রিয়্যা ('আ)	৯২
১৯৬	আল-'আলা ইবন যিয়াদ (ক)	৯৩
১৯৭	আবুল 'আলিয়া ('আ)	৯৪
১৯৮	ইমরান ইবন হিত্তান (খ, দ, ত)	৯৮
১৯৯	সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ('আ)	৯৯
২০০	আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান	১০৯
২০১	আব্দুল আযীয ইবন মারওয়ান	১১০
২০২	আবূ রাজা আল-উত্বাদেরী ('আ)	১১১
২০৩	আর-রাবী' ইবন খুসাইম (খ, ম)	১১২
২০৪	আব্দুর রহমান ইবন আবী লাইলা ('আ)	১১৫
২০৫	আবূ আব্দির রহমান আস-সুলামী ('আ)	১১৫
২০৬	আবূ ইদরীস আল-খাওলানী ('আ)	১১৬
২০৭	উম্মুদ দারদা ('আ)	১১৭
২০৮	যাজান (ম, ৪)	১১৯

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
২৪১	মু'আযা ('আ)	১৮২
২৪২	মুসলিম ইবন ইয়াসার (দ, স, ক)	১৮৩
২৪৩	ইব্রাহীম আন-নখয়ী ('আ)	১৮৪
২৪৪	বকর ইবন আব্দুল্লাহ ('আ)	১৮৬
২৪৫	খালিদ ইবন মা'দান ('আ)	১৮৮
২৪৬	ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ ('আ)	১৯০
২৪৭	রাজা ইবন হাইওয়া (ম, ৪, খ, ত)	১৯৭
২৪৮	হাসান বসরী (৪)	১৯৯
২৪৯	আল-আখত্বাল	২০৫
২৫০	জারীর	২০৬
২৫১	ইয়াযীদ ইবন আবী মুসলিম	২০৭
২৫২	আদ-দ্বাহ্হাক ইবন মুযাহিম (৪)	২০৮
২৫৩	ত্বাল্ক ইবন হাবীব আল-আনাযী (ম, ৪)	২০৯
২৫৪	মুহাম্মাদ ইবন সীরীন	২১০
	সিয়ারু 'আলামিন নুবালা : পঞ্চম খণ্ড	
২৫৫	আব্দুর রহমান (৪)	২১৭
২৫৬	আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ('আ)	২১৭
২৫৭	ইকরিমা (খ, ৪, ম-সংযুক্ত)	২১৮
২৫৮	ত্বাঊস ('আ)	২২০
২৫৯	আল-ক্বাসেম ইবন মুহাম্মাদ ('আ)	২২২
২৬০	ইব্রাহীম ইবন ইয়াযিদ ('আ)	২২৩
২৬১	আল-ক্বুরাযী ('আ)	২২৪
২৬২	মাইমূন ইবন মিহরান (ম, ৪)	২২৫
২৬৩	'আত্বা ইবন আবী রাবাহ ('আ)	২২৭
২৬৪	বিলাল ইবন সা'দ (ত)	২২৮
২৬৫	নাফে' ('আ)	২২৯
২৬৬	সুলাইমান ইবন আব্দুল মালিক	২৩০
২৬৭	উমর ইবন আব্দুল আযীয ('আ)	২৩১
২৬৮	ইয়াযীদ ইবন আব্দুল মালিক	২৪১
২৬৯	কুসাইয়্যির আয্যা	২৪২
	তৃতীয় স্তর	
২৭০	মুয়াবিয়া ইবন কুর্‌রা ('আ)	২৪৩
২৭১	আল-জার্‌রাহ	২৪৩

বড় তাবেয়ীগণ

[১৫৩] মারওয়ান ইবনুল হাকাম[১] (খ)

ইবন আবিল আস। তিনি একজন রাজা ছিলেন। উপনাম আবূ আব্দিল মালিক। তিনি কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রভুক্ত ছিলেন।

তার জন্মস্থান মক্কা। তিনি ইবনুয যুবাইর থেকে চার মাসের ছোট। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহকে দেখেছিলেন। তবে বিষয়টা সম্ভাব্য।

তিনি তার চাচাতো ভাই খলীফা উসমানের নিযুক্ত লেখক ছিলেন। তার কাছেই উসমানের সিল থাকত। তিনি উসমানের সাথে খেয়ানত করে বসেন। তার কারণেই লোকজন উসমানের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পরে তিনি বেঁচে যান এবং উসমানের রক্তের দাবিতে তালহা ও যুবাইরের সাথে যোগদান করেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন তালহাকে তিনি হত্যা করেন। এ যুদ্ধেও তিনি বেঁচে যান। এরপর মুয়াবিয়ার শাসনকালে একাধিকবার তিনি মদিনার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তার বাবাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে মদিনায় ফেরত আনেন। কেননা, তিনি (হাকাম) ছিলেন উসমানের চাচা। ইয়াযিদের ছেলে (মুয়াবিয়া) মারা গেলে মারওয়ান ক্ষমতা দখলের জন্য রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করল। মারওয়ানের সাথে উমাইয়া গোত্রের সবাই যোগ দিল। তিনি আদ-দাহ্হাক আল-ফিহরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন এবং দামেস্ক দখল করেন। তারপর মারওয়ান মিসরে গিয়ে নিজের খিলাফত দাবি করেন।

তিনি সাহসী, বীর, চতুর, ধূর্ত ও সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন।

শাফেয়ী বলেন, উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন পরাজিত হলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মারওয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'তার প্রতি আমার স্নেহ-ভালোবাসার কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাছাড়া সে কুরাইশ যুবকদের একজন নেতা।'

কাবীসা ইবন জাবের বলেন, আমি মুয়াবিয়াকে বললাম, 'আপনি আপনার পর কাকে উপযুক্ত মনে করেন?' মুয়াবিয়া কয়েকজনের নাম বলেন। অবশেষে বলেন, 'আল্লাহর বিধানাবলির ব্যাপারে কঠোর কুরআনের ক্বারী ও ফকীহ মারওয়ান।'

---

১. দেখুন, সিয়ার (৩/৪৭৬-৪৭৯)।

আহমদ বলেন, মারওয়ান উমরের বিচারিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন।

জাফর ইবন মুহাম্মাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হাসান-হোসাইন মারওয়ানের পিছনে সালাত আদায় করতেন এবং তা পুনরায় আদায় করতেন না।

আমি (যাহাবী) বলি, তারপর মারওয়ান নয় মাস শাম ও মিসর দখল করে রাখেন। পঁয়ষট্টি হিজরীর প্রথম রমযানে তিনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান।[১]

ইবন সা'দ বলেন, হার্‌রার যুদ্ধের দিন তিনি মুসরিফ (মুসলিম) ইবন উকবার পক্ষে ছিলেন। তিনি তাকে মদিনাবাসীদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহিত করছিলেন।

ইবন সা'দ বলেন, তিনি তার পরে নিজ সন্তান যথাক্রমে- আব্দুল মালিক ও আব্দুল আযীযকে খিলাফতের পরবর্তী প্রার্থী নিযুক্ত করে যান। মানুষজনকে তিনি খালেদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়ার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করে তুলেন। তিনি খালেদের মান-সম্মানে আঘাত হানেন। তাকে একদিন গালি-গালাজও করেন। মারওয়ান খালেদের মাকে বিবাহ করেছিলেন। সেই স্ত্রী তার জন্য মনে মনে অনিষ্ট পোষণ করত। একবার মারওয়ান ঘুমিয়ে যান। তখন উক্ত মহিলা তার দাসীদের সাথে নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর মহিলা একটি বালিশ দিয়ে তাকে চেপে ধরেন। সে বালিশের চারপাশে দাসীরা চেপে বসে থাকে। এভাবে সে মারা পড়ে। দাসীরা তখন চিৎকার করে ওঠে। আর এটা ধারণা করা হলো যে, তিনি আকস্মিকভাবে মারা যান। এটাও কথিত আছে, তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

***

[১৫৪] কা'ব আল-আহবার[২] (দ, ত, স)

তিনি হলেন কা'ব ইবন মাতে' আল-হিময়ারী। তিনি ইয়ামানের অধিবাসী একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি পূর্বে ইহুদী ছিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মদিনায় আগমন করে সাহাবীদের সাথে ওঠা-বসা করেন। তিনি

---

১. আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ মারওয়ানকে খলীফা মানতেন না। তাকে জবর-দখনকারী মনে করতেন। [অনুবাদ-সম্পাদক]

২. দেখুন, সিয়ার (৩/৪৮৯-৪৯৪)।

ইসরাইলী বর্ণনাগুলো জানতেন। বিস্ময়কর অনেক খবর মুখস্থ ছিল তার।[১] তিনি সাহাবীদের থেকে সুন্নাহ গ্রহণ করতেন। তিনি উত্তম মুসলিম, দীনদার ও বড় আলেম ছিলেন।

তিনি ইহুদীদের গ্রন্থ সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিলেন। এ গ্রন্থের অশুদ্ধ বর্ণনাগুলো থেকে বিশুদ্ধগুলো আলাদা করার যোগ্যতা তার ছিল। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি শামে বসবাস করেন। তিনি সাহাবীদের সাথে জিহাদে শরীক হতেন।

খালেদ ইবন মা'দান বর্ণনা করেন, কা'ব আল-আহবার বলেন, 'আমার সমান আকৃতির স্বর্ণ সদকা করার থেকেও আল্লাহর ভয়ে কাঁদা আমার কাছে প্রিয়।'

কা'ব উসমানের খিলাফতের শেষদিকে এক জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে যাওয়ার প্রাক্কালে হিমসে মারা যান। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানের আধার।

***

[১৫৫] যিয়াদ ইবন আবীহি[২]

যিয়াদ ইবন উবাইদ। তিনি সাক্বীফ গোত্রভুক্ত ছিলেন। তিনি মূলত যিয়াদ ইবন সুমাইয়া। সুমাইয়া তার মা। পরে তিনি হয়ে যান যিয়াদ ইবন আবী সুফিয়ান। মুয়াবিয়া তাকে নিজ ভাই হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

তার উপনাম আবুল মুগীরাহ।

---

১. হাফেয ইবন কাসীর সূরা নামলের তাফসীরে সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে রানী সাবার সম্পর্কে এক গুচ্ছ বর্ণনা পেশ করার পর বলেন, 'এ ধরনের বর্ণনাগুলো অধিকাংশ সময়ে আহলুল কিতাবের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া হয়েছে। যেমন- কা'ব ও ওয়াহ্ব-এর বর্ণনা। এই উম্মতে তারা বনী ইসরাইলের যে সব আজব, উদ্ভট ও অপরিচিত বর্ণনা নিয়ে এসেছে, যার কিছু ঘটেছে আর কিছু ঘটেওনি, কিছু রহিত হয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে বা বিকৃত হয়েছে, সে জন্য আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ আমাদেরকে এর থেকে বিশুদ্ধ, অধিক উপকারী ও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে যথেষ্ট করেছেন। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে (১৩/২৮১-২৮২) এর বাবু ক্বাউলিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ বলেছেন, "তোমরা আহলুল কিতাবকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না।" হাদীসটা হুমাইদ ইবন আব্দির রহমান এর সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, মুয়াবিয়া খিলাফতকালে হজ্জ করার সময় মদিনায় আসলে কুরাইশের এক দল লোকের সাথে কথা বলছিলেন। তখন কা'ব আল-আহবারের প্রসঙ্গ উঠে আসলে তিনি বললেন, 'আহলুল কিতাবের বর্ণনাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী বর্ণনাকারী হলেন এই কা'ব আল-আহবার। এতদসত্ত্বেও তার মিথ্যার ব্যাপারে তাকে আমরা সন্দেহ করে থাকি। কা'ব পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলো থেকে যা বর্ণনা করে তা কোনো আহলুল ইলমের কাছেই প্রমাণ নয়।' আবূ যুর'আ আদ-দিমাশ্ক্বী তার 'তারীখ' গ্রন্থে (১/৫৪৪) বর্ণনা করেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'বকে বলেন, 'তুমি হাদীস বলা ছেড়ে দিবে। নতুবা তোমাকে আমি বানরদের ভূমিতে রেখে আসবো।' তার প্রতি যা কিছু সম্বন্ধযুক্ত করা হয় তার সবই তার থেকে সাব্যস্ত না। মিথ্যুকরা পরবর্তীতে তার প্রতি এমন অনেক কিছু সম্বন্ধযুক্ত করেছে যা তিনি বলেননি।

২. দেখুন, সিয়ার (৩/৪৯৪-৪৯৭)।

কথা বলেছিলেন আলী। এরপর আলী একটা চাদর নিয়ে তার মেয়েকে দিয়ে উমরের কাছে পাঠালেন। পাঠানোর সময় মেয়েকে বললেন, 'গিয়ে বলবে, এটাই সে চাদর, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম।' উম্মু কুলসুম গিয়ে তাই বলল। উমর বললেন, 'তুমি গিয়ে বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আল্লাহও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।' এ কথা বলে তিনি উম্মু কুলসুমের পায়ে হাত রেখে কাপড় সরিয়ে দিলেন। উম্মু কুলসুম বললেন, 'আপনি এমনটা করতে পারলেন?! যদি আপনি আমীরুল মুমিনীন না হতেন তাহলে আপনার নাক আমি ভেঙে দিতাম।' এরপর বাবার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে এক খারাপ বুড়ার কাছে পাঠিয়েছেন!' আলী বললেন, 'প্রিয় মেয়ে, তিনি তো তোমার স্বামী।'

যুহরীসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেন, উমরের ছেলে যাইদকে জন্ম দেন এই উম্মু কুলসুম। কথিত আছে, রুকাইয়্যার জন্মদাত্রীও তিনি।

ইবন ইসহাক বলেন, উমর তাকে রেখে মারা যান। পরে তাকে বিবাহ করেন আউন ইবন জাফর ইবন আবী তালিব। পরে আউনও মারা যান।

ইবন ইসহাক বলেন, এরপর তাকে বিবাহ করেন মুহাম্মাদ ইবন জাফর। মুহাম্মাদও মারা গেলে তার বাবা তাকে আব্দুল্লাহ ইবন জাফরের সাথে বিবাহ দেন। শেষে আব্দুল্লাহর ঘরেই তার মৃত্যু হয়।

আমি (যাহাবী) বলি, এই তিন ভাই – আউন, মুহাম্মাদ ও আব্দুল্লাহ- কারও ঘরে সন্তান জন্ম দেননি তিনি।

কথিত আছে, এক রাতে গোলযোগ দেখা দিলে যাইদ (উমরপুত্র) তাতে জড়িয়ে পড়ে। সংঘাতের মাঝে এক পাথরের আঘাতে তিনি মারা যান। সেটা ছিল মুয়াবিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের প্রারম্ভে। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

***

আরও যারা নবুয়তের যুগ পেয়েছেন

[১৫৮] যাইদ ইবন সূহান[১]

ইবন হুজর। তিনি কুফাবাসী আব্দ গোত্রভুক্ত। তিনি সা'সা'আ ইবন সূহানের ভাই। যাইদের উপনাম আবূ সুলাইমান।

তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় ইবাদতকারী একজন আলেম। সাহাবীদের পরিচিতিমূলক গ্রন্থসমূহে ঐতিহাসিকরা তার নাম উল্লেখ করেছেন। তবে

১. দেখুন, সিয়ার (৩/৫২৫-৫২৮)।

তিনি রাসূলুল্লাহ'র সাহচর্য লাভ করেননি। অবশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

আ'মাশ বলেন, ইবরাহীম বর্ণনা করেন, যাইদ ইবন সূহান কথা বলতেন, তার কথা শুনে এক বেদুঈন বলল, 'আপনার কথাগুলো আমার পছন্দ হয়, কিন্তু আপনার হাত আমাকে সন্দেহে ফেলে দেয়।' যাইদ বললেন, 'তুমি কি দেখছ না, আমার বাম হাত কাটা? (ডান হাত কাটা না)' সে বলল, 'আমি বলতে পারি না (চুরি করলে) ডান হাত নাকি বাম হাত কাটতে হয়।' যাইদ বললেন, 'আল্লাহ সত্যই বলেছেন, ﴿ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﴾ "মরুবাসীরা কুফরী ও নেফাকীতে শক্ত এবং আল্লাহ তার রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার অধিক উপযোগী।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৯৭]

অতঃপর আ'মাশ বর্ণনা করেন, বস্তুত তার হাত নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে কাটা পড়ে যায়।

ইবন আবিল হুযাইল বর্ণনা করেন, উমর যাইদ ইবন সূহানকে ডেকে বাহনে চড়ালেন যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের শাসকদেরকে বাহনে চড়াও। তারপর মানুষজনের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা যাইদ ও যাইদের সাথিদের সাথে এমন আচরণই করবে।'

হুমাইদ ইবন হেলাল বলেন, যাইদ ইবন সূহান উসমানের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আপনি ঝুঁকে পড়েছেন তাই আপনার উম্মতও ঝুঁকে পড়েছে। আপনি সোজা হয়ে যান; তাহলে আপনার উম্মতও সোজা হয়ে যাবে।' উসমান বললেন, 'তুমি কি আমার কথা শুনবে এবং মানবে?' যাইদ বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়!' উসমান তাকে বললেন, 'তাহলে তুমি শামে চলে যাও।' যাইদ তখন স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আদিষ্ট স্থানে চলে গেলেন।

গাইলান ইবন জারীর বর্ণনা করেন, উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন যাইদ ইবন সূহান আহত হলে তাকে নিয়ে আসা হয়। তার কাছে সবাই এসে বলল, 'তুমি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো।' তিনি বললেন, 'তোমরা তো জানো না জান্নাত নাকি জাহান্নাম। শুধু বলতে পারছ দেখে বলছ। আমরা এক-এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তারই দেশে যুদ্ধে নামলাম। তাদের নেতাকে (উসমানকে) হত্যা করলাম। হায়! যদি আমরা নির্যাতিত হয়ে ধৈর্য ধরতাম।'

যাইদ ইবন সূহান বলেন, 'তোমরা আমার রক্ত মুছে দিও না। আমার কাপড়ও খুলো না। শুধু মোজাদুটো খুলে নিও। আর মাটিতে ভালোমত পুঁতে দিও। কিয়ামতের দিন আমি কঠিনভাবে বিতর্ক করব।'

***